অবিবাহিত থাকবে কারা?

অবিবাহিত থাকার পক্ষে আমার যা বক্তব্য, তার সম্বন্ধে প্রথম দু-একটি কথা বলতে চাই। প্রথমত এটাকে একটি থিওরি হিসেবে কেউ যেন না ধরেন। সব সাধারণের পক্ষে এটি প্রযুজ্য এটাও কেউ যেন না ভাবেন। আমি যখন অবিবাহিত থাকার পক্ষেই বলতে দাঁড়িয়েছি, তখন সে সম্বন্ধে যত কিছু ভালো বলা যেতে পারে, তা আমায় বলতেই হবে কিন্তু তবুও এটা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে আমার বক্তব্য মাত্র এক শ্রেনির লোকের পক্ষে প্রযোজ্য।

প্রথমত দেশের অবস্থা নিয়েই আরম্ভ করা যাক। ক'জন তরুণ যুবক কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েই অর্থ উপার্জন করতে থাকেন? গড়ে তাঁদের অনেককেই পাঁচ-ছ'বছর বিনা উপার্জনে বা সামান্য উপার্জনের ওপর নির্ভর করে অতিকষ্টে সংসার চালাতে হয়। এ সংসার তাদরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নয়, তাঁদের বৃদ্ধ বাপ-মা, ও অপোগণ্ড ভাইবোনের সংসার। এর ওপর বিবাহ করে স্ত্রী ঘরে আনবার বিড়ম্বনা যে কি, ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝবেন।

আমি জানি ১৯১৯ সালের দিকে এম.এ. পাশ করেছিল এমন অনেক লোক এখনো বসে আছে। পাশ করবার পরেই তাদের বাপ-মা খুব ঘটা করে ছেলেদের বিবাহ দিয়েছিলেন, ছেলেপুলেও হয়েছে, মেয়েরা বিবাহের যোগ্য হয়ে উঠেচে কিন্তু তাদের অনেকেরই চাকুরি নেই কিংবা সামান্য মাইনের স্কুলমাস্টারি, পরে অনেকে স্ত্রীকে বাপের বাড়ি ফেলে রেখেচে বিয়ে করে পর্যন্ত, নিজের ঘরে এনে ভরণপোষণ করবার ক্ষমতা নেই।

এখানে জিনিসটাকে দেখতে হবে সন্তানদের দিক থেকে। তারা তো নিরপরাধ, পিতা যদি উপার্জনক্ষম না হয়, তাদের সংসারে আনবার কোনো অধিকারই নেই সে পিতার। অপুষ্টিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দেহ রোগগ্রস্ত, তাদের মায়েরা হয়তো কলকাতায় সংকীর্ণ গলিঘুঁজিতে খোলার ঘরে কিংবা স্যাতসেঁতে একতলা ঘরে বাস করে, প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাসের মধ্যে প্রাপ্য তাদের অংশ থেকে চিরবঞ্চিতা থেকে মুখ বুজে সারাজীবন আধপেটা খেয়ে দিন কাটিয়ে দেয়, নয়তো অল্প বয়সে যক্ষ্মা রোগের কবলে প্রাণ হারায়।

মাতৃত্বের বিকাশেই নারীর পূর্ণতা একথা মানি বা সংসার না থাকলে, ছেলেপুলে না থাকলে জীবনের অনেকখানি খালি থেকে যায় একথাও আংশিকভাবে মানি—কিন্তু বিবাহ ও সংসার করবার নামে কতকগুলি নিরপরাধ জীবকে পৃথিবীতে এনে কষ্ট দেওয়ার অধিকার কারো আছে—একথা মানতে পারবো না।

এই গেল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে চোখ রেখে অবিবাহিত থাকার ব্যাপার। পূর্বেই বলেছি এ কেবল এক শ্রেনির লোকের পক্ষেই প্রযুজ্য যাঁরা সন্তানকে খাইয়েদাইয়ে পুষ্টদেহ ও বলবান করে তুলতে না পারেন, শিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে না পারেন, সে অবস্থায় বিবাহ করে সমাজের অশিক্ষিত বা কু-শিক্ষিত, দরিদ্র, রোগগ্রস্ত লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি করে তাদের বংশের মুখ কি করে উজ্জ্বল হয় বা পূর্বপুরুষের নাম কি করে বজায় থাকে, তা আমি বুঝি না।

আর এক দল লোক আছেন, যাঁরা হয়তো জগতে অন্য ধরনের কাজ করতে চান। যাঁরা অনন্যমনা হয়ে জ্ঞানচর্চায় জীবন কাটাতে চান, কোনো বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে থাকতে চান, দার্শনিক চিন্তা নিয়ে জগৎ ও জীবনরহস্যের সমাধানের চেষ্টাকেই অস্তিত্বের পরম সার্থকতা বলে উপলব্ধি করেন—তৈলেন্ধন চিন্তায় দিবারাত্র ব্যস্ত থাকলে চলে না। তাহলে রেডিও অ্যাকটিভ ধাতুর রহস্যভেদ হয় না, পরমাণু ও ইলেকট্রনের আকৃতি ও গঠন নিরূপিত হয় না, অঙ্কশাস্ত্রের নব নব আবিষ্কার সম্ভবপর হয় না।

এখানে প্রশ্ন উঠবে জানি যে লর্ড রাদারফোর্ড, মাদাম কুরী, আইনস্টাইন, হেগেল বা বার্গস—এঁরা কি অবিবাহিত?

ওদের দেশের অবস্থা আর আমাদের দেশের অবস্থায় অনেক প্রভেদ। ওদের দেশে সংসারী থেকেও জ্ঞানচর্চায় যে সুযোগ বা সুবিধা আছে, আমাদের দেশে তা নেই। স্বামীর জ্ঞান-স্পৃহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জীবনসঙ্গিনী লাভ

করা আমাদের বড়ই দুরূহ ব্যাপার। টলস্টয়ের স্ত্রী রাত জেগে স্বামীর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নকল করে প্রেসের জন্যে তৈরি করে দিতেন, আইনস্টাইন যখন তার রিলেটিভিটিবাদের অঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত, খাবার জন্যে উঠবার সময় নেই—তাঁর স্ত্রী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে খাবারের পাত্র সামনে রেখে চলে আসতেন, খানিক পরে গিয়ে দেখে আসতেন স্বামী খাদ্য অভুক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেচেন কিনা, যদি রেখে থাকেন, তবে চামচে করে শিশুর মতো তাকে খাইয়ে আসতেন। শুধু মেয়েদের দিক থেকে সহানুভূতি বা জ্ঞানশক্তির অভাব বলেই যে আমাদের দেশে বহু ক্ষেত্রে এমনটি অসম্ভব তা নয়, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাও এর জন্যে বহু পরিমাণে দায়ী। বাইরের কাজ পুরুষে না করলে করা হবেই না—মেয়েদের ঘর থেকে বেরুবার স্বাধীনতা নেই, সেস্থলে স্ত্রী বেচারির দোষ দিতে পারিনে। অনন্যমনা হয়ে যাঁরা আর্টের চর্চা করতে চান, সংসারের গণ্ডির মধ্যে এলে তাদের শক্তি খানিকটা নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য, যদি তারা অপরিমেয় প্রতিভা ও বিপুল শক্তির অধিকারী না হন। সংসারের বাইরে যে নিঃসঙ্গ, নির্জন জগৎ, সেখানে এমন একটি বিশিষ্ট মনের ভাব গড়ে ওঠে, এমন অনুভূতিরাজির সঙ্গে পরিচয় ঘটে,সংসারের কলকোলাহলে তারা ভীরু বনমৃগের মতো লতাবিতানের গভীর অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকে—তাদের দেখা পাওয়া ভার হয়ে ওঠে।

মনের যে গভীর ভাবকে কার্লাইল বলেচেন 'Mood of Golden Silence' আত্মা যখন নিজের কাছে নিজে ধরা দেয়, নিজের মন নিজেকে জানে—মানুষের সে গভীর আত্মোপলব্ধির অবসর কোথায় নিঃশব্দ অলস অবকাশ ছাড়া?

যে Mood সাহায্য করেছিল বেঠোফেনকে তাঁর সুর সৃষ্টি করতে, গেটেকে 'বার্টারের দুঃখ' ও 'উইলহেল্‌ম মিস্টার' রচনা করতে, পদ্মাবক্ষের বোটে রবীন্দ্রনাথকে 'ছিন্নপত্র' রচনা করতে, নিউটনকে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সে—Mood আসে গভীর নিঃসঙ্গ অবসরের পরম মানসিক মুক্তির মুহূর্তগুলিতে।

সকল কবি ও দার্শনিক তাই 'Silence'-এর জয়গান করে গিয়েচেন। এই 'Silence'কৃত্রিম উপায়ে গড়ে তোলা যায় না—ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরের লোককে ঠেকানো চলে কিন্তু অনুকূল মনের ভাব ও-ভাবে গড়ে ওঠে না। এ মানসিক একটি অবস্থা, বাহ্যিক আবেষ্টনী একে অনেকটা সাহায্য করে বটে। কিন্তু সেটাই এর সব নয়। যেখানে 'Silence' হবে অখণ্ড, আত্মচেতনার সকল অংশ তা অধিকার করতে বাধ্য। অন্তঃপ্রাণ তাতে সাড়া দেবে। এই অনন্যমুখী আত্ম-উন্মীলন আর্টিস্টের মনে ধরা দেয় গভীর আনন্দের রূপে—যে আনন্দ সৃষ্টির প্রকাণ্ড সহায়। যে আনন্দ শক্তি, জ্যোতি, প্রসারতা ও প্রশান্তির আধার। আধ্যাত্মিক অতিমানস সত্যকে যা আর্টিস্টের অন্তর্লোককে ফুটিয়ে তোলে। ক্রমাগত বাইরের বাধা ঠেলে সারাজীবনেও যার নাগাল পাওয়া যায় না, যা কিনা এক বৎসরের আত্মসমাহিত শান্ত জীবনে আসতে পারতো।

নিউটনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি তাঁর জীবনে এত মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কি করে আবিষ্কার করলেন?

তিনি বলেছিলেন—সর্বদা যে এই সব নিয়েই আমি ভাবি।

'By keeping it constantly before my mind, by always thinking and thinking upon it'—

কিন্তু তার পরবর্তী কথা এর চেয়েও গুরুতর।

'Much is done under the conditions and much might be sacrificed to obtain the conditions.'

জনসেবার জন্যে যদি ত্যাগের প্রয়োজন হয়, তবে আর্টিস্টের জীবনে যে জনসেবা, তার জন্যেও বিশেষ স্বার্থ থাকার প্রয়োজন আছে।

এই অনুকূল মানসিক অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে হলে তার জন্যে জমি তৈরি করতে হবে। সংসারের শত প্রকার বন্ধনের মধ্যে যে মুক্তির আস্বাদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তা রবীন্দ্রনাথের মতো যুগজয়ী প্রতিভা যাঁদের, তাঁদের পক্ষে সাজে। সাধারণ আর্টিস্টের পক্ষে তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করাই ভালো। আমি জানি এখানে সংসারের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা উঠবে। কিন্তু এ কথার ওপর যাঁরা জোর দেন, তারা ভুলে যান যে আর্টিস্টের কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টি বলে জিনিস শুধু সাহিত্য-সমালোচকের প্রবন্ধেই আবদ্ধ নয়, বাস্তব জগতেও সত্য। চারিপাশে কি ঘটচে, এ যিনি চোখ খুলে না দেখতে শিখেচেন, তিনি যে উঁচুদরের আর্টিস্ট নন, একথা জোর করে বলা যায়। বাস্তবের মধ্যে চিরজীবন ডুবে থাকলেই কি তার মর্মকথা উপলব্ধি করা যায়?

আর এক শ্রেণির মানুষ আছেন, যাঁদের মনোবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা অপার্থিব স্তরের। তারা নিজেদের সমস্ত সত্তাকে বিলিয়ে দিতে চান জগতের কাজে ভগবানের চরণে। যেমন যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ বিবেকানন্দ, ঋষি রামকৃষ্ণ। যে সব উপকরণে তামসিক বিক্ষোভের সৃষ্টি করে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন, যত সব প্রভাব বিকৃতির জন্ম দেয়, তাদের বহু দূরে পরিহার করে চলা তাঁদের প্রকৃতিগত। তাঁদের বিপুল আত্মবলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনা হয় না। তারা যুগযুগের আলোকবর্তিকাধারী, সত্যের আলোকে প্রমাদের ও অসত্যের অন্ধকার দূর করতে তাঁরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন যুগে যুগে। ভাগবত প্রসাদের উন্মাদন মাধুর্যের ঐন্দ্রজালিক শক্তি তাঁরা অন্তরে অন্তরে আগে অনুভব করেচেন। পরে দুঃখময় সংসারে তা ছড়িয়ে দেবার জন্যে তাঁরা ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। নিজেরা ক্ষুদ্র সুখে মত্ত থাকলে তাঁদের চলে না, তাই সকল প্রকার লোভ, সুখের আকাঙ্ক্ষা, বিকার ও আরামকে তাঁরা ত্যাগ করেচেন। বহুদিন আগে আর এক মহাপুরুষ এই দর্শনেরই প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব আজও তেমনি সত্য। তিনি যে নির্বাণের কথা বলেছিলেন, তা কোনো দূর স্বর্গে আত্মার আত্মচেতনা ও অস্তিত্বের নির্বাণ নয়, মানুষের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষার নির্বাণ। ঊর্ধ্বমুখী অন্তরাত্মার অধ্যাত্ম-তৃষ্ণার নিকট ক্ষুদ্র পার্থিব সুখেচ্ছার নির্বাণ।

কিন্তু এঁদের কথা বাদ দিই। আমাদের কারবার সাধারণ মানুষকে নিয়ে, অতিমানবদের নিয়ে নয়। যাঁরা নিজেদের মনেপ্রাণে অনুভব করেন, বিবাহ করে সংসারী হলে তাঁদের কাজের ব্যাঘাত হবে, তাঁরা অবিবাহিত থাকবেন এ অতি সোজা কথা। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্যে এ নিয়ম চালালে সৃষ্টি উলটে যাবে—এ ভয়ও কেউ না করেন। কারণ প্রথমত Chance-এর অঙ্ক কষে দেখলে দেখা যাবে শতকরা পুরো একজন লোকও কি পুরুষ, কি নারী—প্রকৃতিদত্ত এই অসীম শক্তিশালী দৈব আর্থিক কামনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না, যাঁরা দাঁড়াবার চেষ্টা করবেন, মনের মধ্যে উচ্চতর প্রেরণা সদাসর্বদা অনুভব না করলে তাঁরাও সফল নাও হতে পারেন। তবে যিনি সত্যিই নিজের সঙ্কল্পে অটল থাকবেন, পাশবদ্ধ স্থূল প্রকৃতির পথ ধরে তাঁকে চলতে হবে না। কিন্তু শুধু উপার্জন করতে পারিনি বলে সারাজীবন জ্ঞানত যারা অবিবাহিত থাকবে তারা কাপুরুষ, তাদের কথা এর মধ্যে আসে না।